

## উচ্চ শিক্ষার সঙ্কট

উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্র বিস্তৃত হচ্ছে। এ জন্য গড়ে উঠেছে প্রতিষ্ঠানও। কিন্তু শিক্ষার দিগন্ত আর হয় না প্রসারিত। বরং শিক্ষার নানা সঙ্কটের চিত্র সর্বত্র বিরাজিত। শিক্ষার মান সন্তোষজনক পর্যায়ে উন্নীত করার পদক্ষেপও পরিলক্ষিত হয় না। তবে প্রতিষ্ঠানগুলোর আয়ের ক্ষেত্র ব্যাপক হলেও সার্বিক সুযোগ-সুবিধা ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনার চিহ্ন মেলে না। শিক্ষাদান এবং পরীক্ষা ও খাজ-মূল্যায়ন পদ্ধতি নিয়ে রয়েছে নানা প্রশ্ন। সময়ের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে পরিবর্তন আনা হয় না পরীক্ষা পদ্ধতিতে। শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষায়ও আনা হয় না সংস্কার। দেশে দুই দশকের বেশি সময় ধরে ধারাবাহিকভাবে নতুন বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন দেয়া হচ্ছে। কিন্তু শিক্ষার্থীদের ভর্তি, টিউশন ফি সংক্রান্ত কোন নীতিমালা তৈরি করা হয়নি। বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি ফি, টিউশন ফি এবং শিক্ষকদের বেতন ভাতাসহ অন্যান্য বিষয়ে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য রয়েছে। তা ছাড়া ট্রান্সক্রিপ্ট, সার্টিফিকেট ও প্রশংসাপত্র সরবরাহ করতে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর উচ্চ হারে ফি নেয়ার হাজারো অভিযোগ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন বা ইউজিসিতে জমা হচ্ছে প্রায়শই। কোন যৌক্তিক কারণ ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে প্রতিবছরই সব ফি বাড়ানো হয় বলে অভিভাবক ও শিক্ষার্থীদের অভিযোগের কোন সুরাহা হয় না। দেশে পঁচানব্বইটি বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় এবং আটত্রিশটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। এ ছাড়া জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত প্রায় আড়াই হাজার কলেজে উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠানে বর্তমানে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীর সংখ্যা কমপক্ষে বত্রিশ লাখ। এর মধ্যে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর হাল-হকিকত অধিকাংশ ক্ষেত্রে সুবিধার নয়। কারণ, এসব পরিচালনায় নেই

উচ্চ শিক্ষার নামে  
অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানে  
অবাধে দুর্নীতি,  
অনিয়ম, ভর্তি ও  
সনদ বাণিজ্য চালিয়ে  
যাওয়ার অভিযোগ  
তীব্র হলেও সে সব  
দেখার কেউ নেই।  
মাঝে মাঝে শিক্ষা  
মন্ত্রণালয়ও ইউজিসি  
সতর্ক করে পত্র  
দিলেও বাস্তবে এসব  
সরকারের নিয়ন্ত্রণহীন

নিয়মনীতি। আবার যাওবা রয়েছে, তাও প্রতিপালিত হয় না। অব্যবস্থা আর অনিয়মের মধ্যেই চলেছে এসবের কার্যক্রম। গত চব্বিশ বছরে নিজস্ব ক্যাম্পাসে শিক্ষাকার্যক্রম শুরু করতে পেরেছে মাত্র তেরোটি বিশ্ববিদ্যালয়। আর গবেষণা ছাড়াই চলেছে আটশটি বিশ্ববিদ্যালয়। এর মধ্যে ২০টিতে উপাচার্য, ৬৫টিতে উপ-উপাচার্য এবং ৪৫টিতে নেই কোষাধ্যক্ষ। ভারপ্রাপ্ত দিয়ে চলেছে। প্রতি বছর আয়-ব্যয়ের নিরীক্ষা হিসাব দাখিলের বিধান থাকলেও অধিকাংশই তা জমা দেয় না। আইনের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন হলেও কোন ব্যবস্থা নেয়া হয় না। স্থায়ী সনদ পেয়েছে মাত্র তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়। বাকি সবই চলেছে অস্থায়ী সনদের ভিত্তিতে। যে আইনে প্রতিষ্ঠার অনুমতি পেয়েছে সে আইনে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্দিষ্ট কিছু শর্ত মেনে সেগুলোর স্থায়ী সনদ গ্রহণের বিধান থাকলেও তা করা হয়নি। শুধু এ ক্ষেত্রেই আইন লঙ্ঘিত হচ্ছে তা নয়, বস্তুত আর্থিক কার্যক্রম থেকে শুরু করে সাধারণ প্রশাসনও চলেছে আইনবহির্ভূতভাবে। অভিযোগ রয়েছে, বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অলাভজনক ও সেবাদায়ী প্রতিষ্ঠান রূপে চলার কথা থাকলেও কৌশলে মালিক

পক্ষ অনেকটা পারিবারিক প্রতিষ্ঠানের মতো সেগুলো চালাচ্ছে। উচ্চ শিক্ষার নামে অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানে অবাধে দুর্নীতি, অনিয়ম, ভর্তি ও সনদ বাণিজ্য চালিয়ে যাওয়ার অভিযোগ তীব্র হলেও সে সব দেখার কেউ নেই। মাঝে মাঝে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ও ইউজিসি সতর্ক করে পত্র দিলেও বাস্তবে এসব সরকারের নিয়ন্ত্রণহীন। নিয়ন্ত্রণের বাইরে থাকায় কিছু কিছু প্রতিষ্ঠানে জঙ্গীবাদের প্রচার চলার তথ্যও এসেছে। অনেকে জঙ্গীতে পরিণত হয়েছে। শিক্ষাগুরু সফ্রেটিস থেকে শুরু করে নিকট অতীতের টোল পন্ডিতরা জ্ঞান বিতরণের কাজকে ঐশ্বরিক দায়িত্ব হিসেবে বিবেচনা করতেন। কিন্তু যুগ পরিবর্তনের হাওয়ায় আমূল বদলে গেছে দৃশ্যপট। জ্ঞান বিতরণের কাজটি এখন পরিণত হয়েছে বাণিজ্যের উপকরণে, বিপণি বিতান, বাসস্ট্যান্ড, আবাসিক এলাকা এমনকি শিল্প-কারখানার আশপাশের ভবনে গড়ে ওঠা এসব প্রতিষ্ঠানের না আছে বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক, না আছে জ্ঞানচর্চার মুক্ত পরিবেশ ও সুযোগ। দেশের আর দশটা ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান যেভাবে চলে একই চিত্র যদি বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার ক্ষেত্রেও বিরাজ করে, তবে দেশের উচ্চ শিক্ষাক্ষেত্রে নৈরাজ্য সৃষ্টিকেই উৎসাহ দেয়া হয়। ইউজিসির সর্বশেষ বার্ষিক প্রতিবেদনে দেশের বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার সমস্যা নিয়ে যে চিত্র উঠে এসেছে তা ভয়াবহ। প্রতিবেদনে উত্থাপিত সুপারিশগুলো দ্রুত কার্যকর করা না গেলে শিক্ষাক্ষেত্রে এক চরম অব্যবস্থার বিস্তারই ঘটবে। উচ্চ শিক্ষার এই করুণ অবস্থা দূরীভূত করার ক্ষেত্রে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ বাঞ্ছনীয়।